দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 04 DEC 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ৮ ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
015

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

জাতীয় ঔষধ নীতি ১৯৮২ প্রসংগে

ডাঃ মোহাম্মদ আবুল হাসান

১৯৮২ সনের ৭ই জুন তারিখটি চিকিৎসা জ্ঞানে বাংলাদেশের জন্য এক স্মরণীয় দিন। এই দিনে বাংলাদেশ জাতীয় "ঔষধ নীতি ১৯৮২" জারি করা হয়। এমন এক সময় এই নীতি জারি করা হয় যখন দেশী ও বিদেশী ঔষধ কোম্পানীগুলি ব্যাঙের ছাতার মত প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় ঔষধ তৈরী করতে ব্যস্ত ছিল। তাছাড়া কোন নিয়ম ছাড়াই বিদেশ হতে ঔষধ আমদানী করা হত।

এই নীতি জারি করার অনেক পূর্বেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সমস্ত বিশ্বে ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে ২৩০টি প্রয়োজনীয় ঔষধ তালিকাভুক্ত করেছিল এবং 'জেনেরিক' নামে ঔষধ প্রস্তুত করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিকল্পনাসমূহ প্রথম বাংলাদেশ সরকারই সরকারীভাবে এই ঔষধ নীতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত করেছেন—যা তৃতীয় বিশ্বের বাংলাদেশের মত একটি দরিদ্রতম দেশের জন্য ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এই নীতি শুধু বাংলাদেশে নয় সারাবিশ্বে আলোচিত ও অভিনন্দিত হয়েছে।

ঔষধ এমন একটি পণ্য যা কাঠ, লোহা বা জীব-জানোয়ারের উপর ব্যবহার করা হয় না। তা সরাসরি আল্লাহপাকের সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের উপর ব্যবহার করা হয়। ঔষধের সুফল ও কুফল মানুষ সরাসরি ভোগ করে থাকেন। ঔষধ যেমন জীবন রক্ষাকারী হতে পারে তেমনি কোন কোন ঔষধ কোন কোন ক্ষেত্রে মারাত্মক রূপ নেয়, যার জন্য মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কাজেই সব ঔষধই ঔষধ নয়; কোন কোন ক্ষেত্রে তা "বিষ"। ঔষধ নীতি জারি করার পূর্বে অনেকগুলি ঔষধ ছিল যা বিষের মত। তাছাড়া ঔষধের দোকানগুলিতে ছিল টনিকের ছড়াছড়ি। টনিক মদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তা সাধারণ মানুষ বুঝতো না। আজ আর সবাই টনিকের নামে "মদ" খাওয়ার জন্য পাগল হচ্ছে না। কারণ, ঔষধ নীতি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ায় সাধারণ মানুষ অনেক সচেতন হতে পেরেছেন। এই নীতিটি প্রকাশ করা হয়েছে কোন প্রকার পূর্ব-ঘোষণা বা জল্পনা-কল্পনা ছাড়া। মাননীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের কাজ অত্যধিক গোপন রেখে ছিলেন। যার জন্য পর্যালোচনা করার সময় কোন প্রকার চাপ বা বাধার সম্মুখীন হন নাই। যাদিও পরে অনেক চাপের সম্মুখীন হয়েছেন।

এই নীতি প্রকাশ হওয়ার পর সাধারণভাবে মনে করা হয়েছিল যে, এই নীতিটি চিকিৎসা ক্ষেত্রের সংকট সৃষ্টি করবে। কারণ, যেখানে শত শত ঔষধ দেশের চাহিদার সিংহ ভাগ পূরণ করতে পারেনি সেখানে মাত্র হাতেগোণা কয়েকটি ঔষধের মাধ্যমে চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু বাস্তবে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ঔষধ নীতি জারি করার ছয় বৎসর পরও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি করেনি। কারণ, দেশে ঔষধের সংখ্যা কম হওয়ায় স্বল্প পুঁজি দিয়ে ঔষধ-এর দোকান খোলা যাচ্ছে। বহুজাতিক কোম্পানীর যে সব ঔষধ দেশীয় ফ্যাক্টরীতে তৈরী করা সম্ভব সেগুলি বাতিল করায় বর্তমানে বিদেশী ঔষধগুলি বহুজাতিক কোম্পানী স্থানীয়ভাবে তৈরী করছে বলে বাজারে সেগুলি কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া এখন ঔষধের দোকানে হাজার হাজার ঔষধের প্রয়োজন হচ্ছে না। স্বল্পসংখ্যক কতগুলি অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ হলেই ফার্মেসী খোলা যাচ্ছে। সবগুলি ঔষধ কোম্পানী অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ প্রস্তুত করায় তাদের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ নিয়ে প্রতিযোগিতা চলছে। এর জন্য অনেকগুলি ঔষধ কোম্পানী দোকানদারকে "অধিক হারে বোনাস দিচ্ছে। কারণ, তারা এখন কম দামে বেশী বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জন করতে চাচ্ছে। যার জন্য ঔষধ নীতি জারি করার কয়েক বৎসর পরও ঔষধের দাম বাড়ে নাই, উপরন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক কমেছে। তাছাড়া জনগণ টনিকের নামে এখন 'মদ' খাওয়ার জন্য পাগল হচ্ছে না। সেই অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করাচ্ছে। এই নীতি জারি করার আগে ঔষধ ছিল এমন একটি পণ্য—যা নিয়ে জনসাধারণের কোন মাথা ব্যথা ছিল না। ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যেই এই নীতির বিসৃত প্রভাব এ ব্যাপারে তাদের সামগ্রিক আগ্রহকে উদ্দীপিত করেছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে, বিষয়টি তাদের সামগ্রিক কল্যাণের সাথে জড়িত।

এই নীতি তাদের এইকথা বুঝতে সাহায্য করেছে যে, তাদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়টি তাদের জীবনের অন্যান্য চাহিদা— অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের চাহিদার মতই গুরুত্বপূর্ণ। এতে তারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক সচেতন হয়েছে এবং ঔষধের বাজারও প্রসারিত হয়েছে। কেননা, জনসাধারণ আগের চেয়ে অনেক বেশী হারে চিকিৎসা ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছে। এই নীতির ফলশ্রুতিতে জনসাধারণ ক্ষতিকারক ঔষধের আক্রমণ ও অপচয় হতে রক্ষা পেয়েছে।

এখন থেকে যে ঔষধগুলি নতুন করে তৈরী করা হবে সেইগুলি যদি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী "জেনেরিক" নামে তৈরী করার ব্যবস্থা করা হয় তবে ঔষধের দাম আরো কমবে বলে আমরা আশা করি। তবে এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ঔষধের দাম কমাতে গিয়ে যেন ঔষধের গুণগতমান যাতে না কমে। কারণ, ঔষধ নীতিতে অংগীকার করা হয়েছিল যে, দেশের জনগণকে সুলভমূল্যে যথাযথ মানের ঔষধের নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে।

ঔষধ নীতির আর একটি সুফল হলো যে, দেশে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ অধিক হারে তৈরী করায় বিদেশ হতে ঔষধের আমদানী হ্রাস পেয়েছে। তার জন্য বছরে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচে যাচ্ছে। তাছাড়া স্থানীয়ভাবে অধিক হারে ঔষধ তৈরী করায় বেকার সমস্যা কিঞ্চিৎ হলেও দূর হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সরকারের নমনীয়তায় স্বল্পসংখ্যক অসাধু ব্যবসায়ী কিছু কিছু ঔষধ চোরা পথে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও অন্যান্য দেশ হতে আমদানী করে জাতীয় ঔষধ নীতিকে কলঙ্কিত করতে চাচ্ছে। তারা জানে না যে, ভারতের ঔষধের চেয়েও আমাদের দেশের তৈরী ঔষধের গুণগতমান অনেক ভাল। কারণ, দেখা যায় যে, ভারতে আমাদের দেশের ঔষধের চাহিদা প্রচুর। কারণ, আমাদের দেশে ঔষধ তৈরী করার সময় আন্তর্জাতিক স্ট্যাণ্ডার্ড মেনে চলা হয়। সুতরাং সরকারের উচিৎ ভারতের তৈরী এসব নিম্নমানের ঔষধ আমদানীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নইলে জাতীয় ঔষধ নীতি দ্বারা সুফলের স্থলে কুফলই বেশী হবে।

সরকারকে শুধু অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ নিয়ন্ত্রণ করলে চলবে না; হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী ঔষধও নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। কারণ, সেখানেও অনেক অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর ঔষধ আছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, ঔষধ প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে বাতিলকৃত ঔষধ ভিটামিন, কফ সিরাপ, অনজাইম ইত্যাদি বিভিন্ন প্রস্থায় আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী কোম্পানীগুলি প্রস্তুত করছে। এটা জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই না। সরকারের এই সব ঔষধ তৈরী করা বন্ধ করার ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। ঔষধ নিয়ে কোন অবস্থাতেই ছিনিমিনি খেলা যায় না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে ঔষধ নীতি জারি করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য কোন অবস্থায় বানচাল করতে দেওয়া যায় না।

সবচেয়ে দুঃখজনক হলেও সত্য যে; ট্রেন, বাস, হাট-বাজার ও ফুটপাতের একশ্রেণীর অসাধু ঔষধ ব্যবসায়ী তাদের গলাবাজির জোরে এক ধরনের বড়ি দিয়ে দুনিয়ার সব রোগ ভালো করে ফেলেন। এমনকি মৃত মানুষকে জ্যান্ত করে ফেলেন। তারা জানেনা যে, তাদের ঠগবাজিতে কত নিরীহ মানুষ অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করছে। সরকার ও প্রচার মাধ্যমগুলির উচিৎ এদের ধাপ্পাবাজি থেকে নিরীহ জনসাধারণকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সরকার শুধু ঔষধ নীতি জারি করে শেষ মনে করলে চলবে না। তার সুফল যাতে আরও বেশী করে সাধারণ মানুষ ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। আর এটা শুধু সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। তার জন্য ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্স ফার্মাসিস্ট, মেডিকেল এসিসটেন্ট, গ্রাম্য চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মী, ঔষধ কোম্পানী, ছোট-বড় ঔষধের দোকানদারসহ সবারই সহযোগিতা প্রয়োজন। যারা ঔষধের সহিত জড়িত তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তারা এক মহান সেবায় জড়িত। তাদের সহযোগিতা ছাড়া "২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য"—এই শ্লোগান বাস্তবায়ন করা কিছুতেই সম্ভব হবে না।